প্রথম আলো



মতামত

# মাধ্যমিক শিক্ষা যেভাবে সংস্কার করা দরকার

দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা অগ্রাধিকার তালিকার একেবারে পেছনে পড়ে আছে। মাধ্যমিক শিক্ষা যেভাবে সংস্কার করা দরকার, তা নিয়ে লিখেছেন **জিয়া হায়দার রহমান**

আপডেট: ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮: ৩৫

বছর কয়েক আগের কথা। আমস্টারডামে গিয়েছি। শহরের বিমানবন্দরে নেমে ট্যাক্সিতে উঠলাম। চালককে বললাম, ‘দুঃখিত, আমি ডাচ্ ভাষা জানি না। আপনি কি ইংরেজি বলতে পারেন?’ চালক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমার

দিকে যেভাবে তাকালেন তাতে বুঝলাম, তিনি আমার ওপর খুবই বিরক্ত হয়েছেন। সেদিন পরে বন্ধুদের কাছে ঘটনাটা বললে তারা চালকের ওই দৃষ্টির একটি মজার ব্যাখ্যা দিল। সেই ব্যাখ্যায় পরে আসছি।

শিক্ষা উপদেষ্টার গঠিত কমিশন যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, সেটি দেখে আমার আমস্টারডামের ঘটনাটির কথা মনে পড়ে গেল। এই ব্যতিক্রমী প্রতিবেদন মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের জন্য একটি কাঠামো দিয়েছে। কাঠামোটির নাম ন্যাশনাল লার্নিং ইমপ্লিমেন্টেশন ফ্রেমওয়ার্ক (এনএলআইএফ)। একই সঙ্গে প্রতিবেদনটি মাধ্যমিক শিক্ষা কেমন হতে পারে, তার একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরেছে।

এই প্রতিবেদনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এর মূল দর্শন। এখানে আলাদা আলাদা নীতির তালিকা দেওয়া হয়নি; বরং শিক্ষা পরিচালনার পুরো ব্যবস্থায় কোথায় ও কেন সমস্যা হচ্ছে, সেই ব্যবস্থাগত ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নতুন পাঠ্যক্রমের খুঁটিনাটি তালিকা না করে কমিটি দেখিয়েছে, কীভাবে ভুল প্রণোদনা ও ভুল সংকেতের কারণে শিক্ষাসংস্কার বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কীভাবে ভালো সংস্কার করা যায় এবং কীভাবে সেই সংস্কার দীর্ঘ মেয়াদে টিকিয়ে রাখা যায়—এ বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশনাই মূলত প্রতিবেদনটির আসল শক্তি। তারা পুরো শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে সংকেত ও প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে এ কথা বলেছেন।

---

> পরীক্ষা যেভাবে নেওয়া হয়, শিক্ষকও সেভাবেই পড়ান। পরীক্ষা যদি মুখস্থ চায়, শিক্ষক মুখস্থ করান। কারণ, ব্যবস্থা তাঁকে সেটাই করতে বলে।

কমিটির চিহ্নিত করা একটি বড় সমস্যা হলো, প্রকৃত দক্ষতা বা পারদর্শিতাকে (মাস্টারি) মূল লক্ষ্য না বানিয়ে কেবল পরীক্ষার ফলকে গুরুত্ব দেওয়া। স্বাধীনভাবে করা শিক্ষাগত মূল্যায়ন দেখিয়েছে, পরীক্ষার নম্বর আর শিক্ষার্থীদের বাস্তব দক্ষতার মধ্যে ফারাক ক্রমেই বাড়ছে। ফলে নম্বর বা গ্রেড শিক্ষাব্যবস্থাকে ভুল বার্তা দিচ্ছে এবং প্রকৃত অবস্থাটা আড়াল হয়ে যাচ্ছে।

বাস্তবে দেখা গেছে, শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে দায়িত্বশীলেরা প্রায়ই লক্ষ্য পূরণ হয়েছে, এই ভ্রান্ত ধারণা ধরে রাখতে মানদণ্ড নিচে নামিয়ে দেন। এতে সমস্যার সমাধান হয় না, বরং সমস্যা আরও চাপা পড়ে। কিন্তু ভুল সংকেতের (সিগন্যালিং ডিস্টরশন) প্রভাব শুধু শিক্ষার্থীদের ফলাফলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আদর্শভাবে পরীক্ষার ফল দেখে বোঝা যাওয়ার কথা—কোন শিক্ষক ভালো পড়াচ্ছেন আর কোথায় সমস্যা আছে। সেই তথ্য ব্যবহার করে শিক্ষার মান উন্নত করা এবং শিক্ষকদের পদোন্নতি দেওয়ার কথা।

কিন্তু বাস্তবে ১০ বছরের বেশি সময় ধরে উল্টোটা হচ্ছে। পরীক্ষার ফল ঠিকভাবে শিক্ষকের আসল দক্ষতা দেখাচ্ছে না। তবু এই ভুল ফলাফলকেই ভিত্তি করে পদোন্নতির মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। ফলে যাঁরা ভালো পড়ান, তাঁরা আলাদা করে চিহ্নিত হচ্ছেন না, আর যাঁদের পড়ানোর পদ্ধতিতে সমস্যা আছে, সেটিও ধরা পড়ছে না। এতে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটাই ভুল পথে চলতে থাকে। ভাষা ও গণিতের মতো মূল দক্ষতা আয়ত্ত করার বদলে,

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা এমন বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়েছে, যা আসলে দক্ষতা আয়ত্তের জন্য ক্ষতিকর —যেমন রট-নির্ভর (না বুঝে) মুখস্থ করা। মানুষের ইতিহাসে কোনো সময়েই মুখস্থ করা কোনো দক্ষতা শেখার মাধ্যম ছিল না।

আসলে শিক্ষাসংস্কার সহজ হবে না। এটি কষ্টসাপেক্ষ হবে। কমিটি বলছে, কিছু সংস্কার ধাপে ধাপে করা যেতে পারে, কিন্তু কিছু সংস্কারের বিষয়ে আর দেরি করা চলবে না। পরীক্ষার মান বাড়াতেই হবে; এমনকি যদি রাতারাতি ফলাফল ভয়াবহভাবে খারাপ হয়ে যায়, তাহলেও। কারণ, পরীক্ষা যদি সত্যিকার অর্থে শিক্ষার্থীর দক্ষতা যাচাই করে, তাহলে গ্রেড পুরো শিক্ষাব্যবস্থার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংকেত হিসেবে কাজ করে। খারাপ ফলাফল মানে হলো পাঠ্যক্রম, পাঠদান পদ্ধতি ও পাঠ্যবইয়ের জরুরি সংস্কার প্রয়োজন।

---

> পরীক্ষার মান বাড়াতেই হবে; এমনকি যদি রাতারাতি ফলাফল ভয়াবহভাবে খারাপ হয়ে যায়, তাহলেও।

জিয়া হায়দার রহমান

এখানে পরিষ্কার করে বলা দরকার, পরীক্ষার মান বাড়ানো মানে শুধু ‘পরীক্ষা কঠিন করা’ নয়। পরীক্ষাকে পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, পাঠ্যক্রমকে পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে মিলতে হবে আর সবকিছুকেই এমন একটি শিক্ষাগত লক্ষ্য ও দক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, যা অর্জন করাই শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য। শুরুতে

স্বাভাবিকভাবেই ফলাফল মারাত্মকভাবে নেমে যাবে। এটা এমন নয় যে সমস্যার মূল কারণ শুধু শিক্ষকদের অসততা বা অদক্ষতা। অনেক সময় শিক্ষকেরা ইচ্ছা করে ভুল কিছু করছেন না। তাঁরা যেভাবে পড়াচ্ছেন, সেটা আসলে পুরো ব্যবস্থা তাঁদের যেভাবে চালনা করছে, তারই ফল। ব্যবস্থা শিক্ষককে যে বার্তা দেয়, শিক্ষক সেটারই জবাব দেন। এখানে পরীক্ষার ফলই হলো সেই বার্তা। পরীক্ষা যেভাবে নেওয়া হয়, শিক্ষকও সেভাবেই পড়ান। পরীক্ষা যদি মুখস্থ চায়, শিক্ষক মুখস্থ করান। কারণ, ব্যবস্থা তাঁকে সেটাই করতে বলে।

বহু মানুষের সমন্বয় ছাড়াই একের পর এক বিষয় যোগ করতে গিয়ে পাঠ্যক্রম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। এর ফলে দক্ষতা অর্জনের মূল লক্ষ্যটাই হারিয়ে গেছে। তবে সমস্যাটা শুধু পাঠ্যক্রম বেশি বিস্তৃত হওয়া নয়। আসল সমস্যা হলো, প্রত্যাশিত শেখার ফলাফল, ক্লাসে পড়ানোর জন্য সময়, পাঠ্যক্রম ও বইয়ে ধরে নেওয়া শেখার গতি আর এমন মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে অমিল, যেখানে দক্ষতার চেয়ে বিষয় 'শেষ করা'কেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কমিটি যে 'দক্ষতা আয়ত্তের' ওপর এত জোর দিচ্ছে, তার পেছনে রয়েছে শক্ত গবেষণালব্ধ প্রমাণ। মাধ্যমিক স্তরে বেশি বিষয় ছুঁয়ে যাওয়ার চেয়ে অল্প বিষয়ের গভীরে যাওয়া ও ভালোভাবে আয়ত্ত করাই যে কার্যকর, আধুনিক গবেষণা সেটাই বলছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিফলিত হতে হবে।

সংস্কারের জন্য কিছু ন্যূনতম শর্ত দরকার। এনএলআইএফ প্রতিবেদনে সংস্কারের জন্য সাতটি 'অপরিহার্য শর্ত' (নন-নেগোশিয়েবল) নির্ধারণ করা হয়েছে, যেগুলো সব ধরনের সংস্কারের ভিত্তি হতে হবে। এর মধ্যে আছে প্রাথমিক স্তরের মৌলিক শেখা সুরক্ষিত রাখা; প্রশাসনিক কাজের চাপে যেন শিক্ষাদানের সময় নষ্ট না হয়, তা নিশ্চিত করা; পাঠ্যক্রম-পাঠ্যবই-পদোন্নতির কাঠামোর মধ্যে সামঞ্জস্য আনা এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনা ও তা ধরে রাখা। নতুন কোনো উদ্যোগ নেওয়া যাবে কেবল তখনই, যখন তা বিদ্যমান কোনো কাজকে বদলাবে, একীভূত করবে, অথবা বন্ধ করবে। একের পর এক নতুন উদ্যোগ যোগ করার যে প্রবণতা, তা এখনই বন্ধ করতে হবে। এই শর্তগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা হলো, ব্যবস্থায় কোথাও কোনো সমস্যা বা ইঙ্গিত দেখা দিলে কে তার দায়িত্ব নেবে, তা পরিষ্কার করে ঠিক করা।

---

> এখানে পরিষ্কার করে বলা দরকার, পরীক্ষার মান বাড়ানো মানে শুধু 'পরীক্ষা কঠিন করা' নয়। পরীক্ষাকে পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, পাঠ্যক্রমকে পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে মিলতে হবে আর সবকিছুকেই এমন একটি শিক্ষাগত লক্ষ্য ও দক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, যা অর্জন করাই শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

সারিবদ্ধভাবে স্কুলে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা *ফাইল ছবি*

সর্বশেষ কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নন-নেগোশিয়েবল বিষয়টি হলো, ব্যবস্থার প্রতিটি সংকেত বা সমস্যার জবাবদিহির দায়িত্ব কার, তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারী ও শেষ না হওয়া পাইলট প্রকল্পের ছড়াছড়ি চলতেই থাকবে, যত দিন না এসবের দায়দায়িত্ব কার ওপর, তা পরিষ্কারভাবে ঠিক করা হচ্ছে। যখন কোনো নির্দিষ্ট পাইলট প্রকল্পের জন্য কার দায়িত্ব, তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা থাকে না, তখন সেই পাইলট থেকে পাওয়া কোনো শিক্ষা বা অভিজ্ঞতাই কাজে লাগে না। ফলে প্রকল্পটি অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতেই থাকে আর পাইলট প্রকল্প চালুর আসল উদ্দেশ্যটাই হারিয়ে যায়।

একটি ব্যতিক্রম ছাড়া কমিটি পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করে দিতে চায়নি। তারা দুটি বিষয়কে যেকোনো পাঠ্যক্রমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জোর দিয়েছে (আমার মতে, এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়েছে—সে কথায় পরে আসছি)। প্রথমটি হলো বাংলা ভাষাশিক্ষা, যার গুরুত্ব আলাদা করে বলার দরকার নেই। দ্বিতীয়টি হলো গণিত। শত শত বছর ধরেই ভালো শিক্ষার ধারণার সঙ্গে গণিত শিক্ষার সম্পর্ক আছে—এমনকি সেই সময়েও, যখন শিক্ষা ছিল অলস অভিজাতদের বিষয়। আজ সারা বিশ্বেই মাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা দ্বিঘাত সমীকরণ বা ত্রিকোণমিতির সূত্র শেখে, যদিও তাদের ৯৯ শতাংশই স্কুল ছাড়ার পর আর কখনো এসব কাজে লাগাবে না। তবু দীর্ঘদিন ধরে এবং বহু সমাজে শিশুদের এসব শেখানো হয়। এর পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে।

বহু মানুষের সমন্বয় ছাড়াই একের পর এক বিষয় যোগ করতে গিয়ে পাঠ্যক্রম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। এর ফলে দক্ষতা অর্জনের মূল লক্ষ্যটাই হারিয়ে গেছে।

একই কথা বারবার বলার অস্বস্তি নিয়ে আমি প্রায়ই বলি, গণিত হলো তথ্যের বোঝা ছাড়াই চিন্তা করতে শেখার শিক্ষা। যুক্তরাজ্যের আপিল আদালতের এক বিচারক যখন জানলেন, আমিও তাঁর মতো স্নাতক পর্যায়ে গণিত পড়েছি, তখন তিনি আমাকে এ কথা বলেছিলেন। যুক্তিকে বিন্যস্ত করা শেখানোর জন্য গণিতের মতো কার্যকর বিষয় আর নেই। অন্য সব বিষয়ে আগে অনেক তথ্য মুখস্থ করতে হয়, তারপর সেই তথ্য দিয়ে যুক্তি করা শেখা যায়। এখানেই মুখস্থ করে পড়ার ক্ষতি সবচেয়ে পরিষ্কার দেখা যায়। যদি পরীক্ষা শুধু এটাই দেখে যে শিক্ষার্থী দ্বিঘাতের সূত্র মুখস্থ বলতে পারে কি না, তাহলে যারা মুখস্থ করে পড়ায় এবং মুখস্থ করে শেখে—তারাই ভালো ফল পায়। কিন্তু যে শিক্ষার্থী শুধু সূত্র মুখস্থ করেছে, সে আসলে তেমন কিছু শেখেনি। আর যে শিক্ষার্থী বুঝে বুঝে, যুক্তি দিয়ে সূত্রটা বের করতে শিখেছে, সে শিখেছে কীভাবে চিন্তা করতে হয়। ভবিষ্যতে সে দ্বিঘাত সমীকরণ ভুলে গেলেও, চিন্তা করার সেই ক্ষমতা তার থেকে যাবে।

দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা সরকারগুলোর অগ্রাধিকার তালিকার একেবারে পেছনে পড়ে আছে। কেন এমন হয়েছে, তা বোঝা কঠিন নয়। বাংলাদেশের এলিট শ্রেণি টাকার জোরে রাষ্ট্রের দুর্বল মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিয়েছে। এখান থেকেই আমি সেই বিষয়ের কথায় আসছি, যেটির কথা কমিটি উল্লেখ করেনি। আর এই কথায় গিয়েই আবার মনে পড়ে যায় সেই ডাচ ট্যাক্সিচালকের বিরক্ত হওয়ার ঘটনাটা।

বন্ধুরা আমাকে ব্যাখ্যা করেছিল, ট্যাক্সিচালককে ইংরেজি জানেন কি না, জিজ্ঞেস করাটা এমনভাবে ধরা যেতে পারে, যেন তাঁকে নিরক্ষর বা নীচু শ্রেণির মানুষ বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। সেখানে প্রায় সবাই ইংরেজি জানে—অন্তত পথনির্দেশ দেওয়ার মতো হলেও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি দখলের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর নেদারল্যান্ডস (যে দেশটি এমন সব প্রতিবেশী দিয়ে ঘেরা, যাদের ভাষা ডাচ নয়) সিদ্ধান্ত নেয়, শিশুদের অন্তত আরও দুটি ভাষা শেখানো হবে।

---

> বাংলাদেশে শিক্ষা সংস্কারের চেয়ে বড় অগ্রাধিকার আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। এমন আর কোনো ক্ষেত্র নেই, যা লাখো মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে এবং দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎকে এতটা রূপান্তর করতে পারে।

প্রতীকী ছবি

গবেষণালব্ধ জ্ঞান পরিষ্কারভাবে বলে, শৈশবে নতুন ভাষা শেখার আলাদা মানসিক উপকারিতা আছে, যা শুধু ভাষা শেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—এমনকি স্থানিক চিন্তাশক্তিও এতে উন্নত হয় (গবেষণায় আরও দেখা গেছে—প্রাপ্তবয়স্ক বয়সে ভাষা শিখলে এই সুবিধাগুলো পাওয়া যায় না)। মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক লাভের পাশাপাশি এর একটি বড় অর্থনৈতিক লাভও আছে। এমন একটি ভাষা আছে, যেখানে মানুষের এখন পর্যন্ত অর্জিত জ্ঞানের বড় অংশ সংরক্ষিত। আজকের অর্থনীতি মূলত সেই জ্ঞান ব্যবহার করেই চলে। আমি আন্দাজ করতে পারি, কেন কমিটি

আশ্চর্যজনকভাবে ইংরেজির কথা আলাদা করে বলেনি। আমার ধারণা, তাঁরা সুস্পষ্ট বিষয়টি; অর্থাৎ ইংরেজিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত—এ কথা খোলাখুলি বলতে চাননি। কারণ, এতে ভাষাগত জাতীয়তাবাদ উসকে উঠতে পারে এবং পুরো প্রতিবেদনের গ্রহণযোগ্যতাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ভাষা নিয়ে আলোচনা মানেই প্রবল আবেগের বিস্ফোরণ, যা বোঝার মতো হলেও বাস্তবে সহায়ক নয়।

বাংলাদেশের এলিট শ্রেণি স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে বা এমন স্কুলে পাঠায়, যেখানে ইংরেজি শেখানোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেগুলো থাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বাইরে। ভাষা শেখানোর প্রশ্ন তাদের মাথাব্যথা নয়। আর যেহেতু নীতিনির্ধারণের এজেন্ডা মূলত এই এলিটরাই ঠিক করে, তাই বহু বছর ধরে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার গুরুত্বের তালিকার পেছনেই পড়ে আছে।

বাংলাদেশে শিক্ষা সংস্কারের চেয়ে বড় অগ্রাধিকার আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। এমন আর কোনো ক্ষেত্র নেই, যা লাখো মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে এবং দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎকে এতটা রূপান্তর করতে পারে। আর এই প্রতিবেদনের মতো করে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা ও কী ধরনের মৌলিক পরিবর্তন দরকার, এত স্পষ্ট ও সমন্বিতভাবে আর কিছুই তুলে ধরেনি। এই অসাধারণ প্রতিবেদনটির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে পরবর্তী সরকার, নাগরিক সমাজ এবং সাধারণ মানুষের ওপর। সরকার বা নাগরিক সমাজের ওপর ভরসা করতে হলে আশাবাদী হওয়া কঠিন। তবু কিছুটা আশা জাগে এই কারণে যে জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থান দেখিয়ে দিয়েছে, মানুষের হাতে এখনো কিছু ক্ষমতা আছে।

**জিয়া হায়দার রহমান:** বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক; তিনি জেমস টেইট ব্ল্যাক মেমোরিয়াল পুরস্কার পেয়েছেন।

* মতামত লেখকের নিজস্ব

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৬ প্রথম আলো